

## প্রাণঘাতী বজ্রপাত: সচেতনতা ও আগাম সতর্কতা

### সেলিনা আক্তার

যেসব ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারাকে ব্যাহত করে মানুষের সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে এবং যার জন্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয়, তাদের দুর্যোগ বলে। আর প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি দুর্যোগকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো - অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, থরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ইত্যাদি। বজ্রপাত হলো মেঘের মধ্যে বা মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত সৃষ্টি হৈদুর্যতিক চার্জের এক ধরনের নির্গমন। যখন মেঘে থাকা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে বা মেঘের নিচের ভূমির সাথে চার্জের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে আলোকরশ্মি ও শব্দের সৃষ্টি হয়, যা আমরা আলো বলকানি ও বিকট শব্দ হিসেবে শুনতে পাই।

বাংলাদেশে বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। কারণ, বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উভয়ের রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে, যেখান থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণে বজ্র মেঘ তৈরি হয় এবং এসব মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে বজ্রপাত হয়। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলোর অন্যতম। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি থাকায় এ পরিস্থিতির তৈরি হয়। আবহাওয়াবিদদের মতে, যেসব এলাকায় গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে সেসব এলাকায় যে মেঘের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে। তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ঘন ঘন বজ্রপাতজনিত দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। লম্বা গাছ কেটে ফেলায় গ্রামীণ এলাকায় বজ্রপাতের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রাকৃতিকভাবে বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা হাস পেয়েছে ও মানুষের জন্য ঝুঁকি বেড়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, প্রাক-বর্ষাকাল অর্থাৎ, মার্চ থেকে মে মাসে দেশে ৩৮ শতাংশ বজ্রবাড় হয়। বর্ষা অর্থাৎ, জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চার মাসে ৫১ শতাংশ বজ্রবাড় হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়, যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল থেকে জুন মাসে। আবহাওয়াবিদদের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে উত্তর, উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ। বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা বেশি ঘটে হাওর অঞ্চলে। কেননা এসব অঞ্চলে জলীয় বাস্প বেশি থাকে। সে হিসেবে নেতৃত্বকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট এবং সেইসাথে টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ বজ্রপাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, রংপুর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রাঙ্গামাছিয়ায়ও বজ্রবাড় বেশি হয়। বজ্রপাতে বেশি মৃত্যু হয় কৃষকদের। কারণ, তাঁরা খোলা মাঠে কাজ করেন এবং খালি পায়ে কাজ করেন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর বজ্রপাতে ১৫০ থেকে ২০০ মানুষ মারা যায় যাদের বেশিরভাগই কৃষক। সেইসঙ্গে অনেক গবাদি পশুও মারা যায়। বার্ষিক প্রাণহানির এই সংখ্যার বিচারে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান গঞ্চল। মৃত্যুর সংখ্যা বিচার করে সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বনাঞ্চল বৃদ্ধিসহ সরকার বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে আগাম সতর্কতা বা পূর্বাভাস দেওয়া এবং সচেতনতা বাড়াতে নিরলসভাবে কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম কালের কঠিনে বলেন, “আমরা এখন গুরুত্ব দিচ্ছি আর্লি ওয়ার্নিংসে (আগাম সতর্কতায়)। এখন ১০ থেকে ১৫ মিনিট আগে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। আর্লি ওয়ার্নিং যদি আমরা যথাযথ সময়ে দিতে পারি এবং এসএমএস বা ফোন

কলের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করে দিতে পারি, তাহলে তা কাজে দেবে বলে মনে করি। সেই নিরিখেই কাজ হচ্ছে এখন। আধঘণ্টা আগেও বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। আধঘণ্টা মানে অনেক সময়। আধঘণ্টা আগে যদি আমরা পূর্বাভাস দিয়ে সতর্ক করতে পারি, তাহলে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রথমবারের মতো বজ্রপাতের সতর্কবার্তা জারি করেছে চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল। সেদিন প্রথম সতর্কবার্তায় দেশের ২৭ জেলার জন্য বজ্রপাত ও বজ্রবৃষ্টির সতর্কতা জারি করে অধিদপ্তর। এর পর থেকে নিয়মিত বজ্রপাতের আগাম সতর্কতা ও পূর্বাভাস দিয়ে আসছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। কিন্তু, বজ্রপাতের তথ্য বা সতর্কতা প্রাণ্তিক মানুষের কাছে গৌছানোই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তাই, যেসব অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে, সেসব এলাকার মোবাইল টাওয়ার ব্যবহার করে মেসেজ বা ফোনকলের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা যেতে পারে। বজ্রপাতে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম সতর্কতা ও সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে আগাম সতর্কতা প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে গার্নস গাইড, বয়জ স্কাউট, রেড ক্রস, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটির স্বেচ্ছাসেবীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজে লাগানো যায়। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বজ্রপাতসহ বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কাজে সম্পৃক্ত করা গেলে সাধারণ মানুষের কাছে দুট বজ্রপাতের তথ্য পৌছানো সম্ভব হবে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বজ্রপাতের সময় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরি করেছে। বজ্রপাতের সময় তা অনুসরণ করলে অনেক বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তাই, বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশমালা মানা খুব জরুরি।

এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে। ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহিরে না যাওয়া; অতি জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রবারের জুতা পড়ে বাইরে বের হওয়া। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উচু স্থানে না থাকা। বজ্রপাতের সময় খানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতে হবে। যত দুট সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। উচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুরুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটানো যাবে না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকা যাবে না। জানালা বৰ্ক রাখুন এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এগুলো বৰ্ক রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজেদেরও বিরত রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ছাউনি বিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাওয়া যাবে না, তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বৰ্ক রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে। প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্র নিরোধক দড় স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যেতে হবে। কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যেতে হবে। বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দুট চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্র আহত ব্যক্তির শাস-প্রশ্বাস ও হৃদ স্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তুতি নেবার সুযোগ থাকলেও বজ্রপাতের বিষয়টি অনেকটা ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক। কিন্তু আবহাওয়াবিদরা, রেডার ইমেজে মেঘের অবস্থান অনেক ওপরের দিকে দেখলে সেইসাথে বায়ুমণ্ডলে অস্থিতিশীল অবস্থা থাকলে দুই নম্বর সতর্ক সংকেত দিয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় আকাশে কালো মেঘ ও বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলেই সবাইকে সাথে সাথে খোলা জায়গা ছেড়ে দুট নিরাপদে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। এসব পরামর্শ মেনে চললে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে নিরাপদে থাকা যাবে। বাড়ি-ঘর তৈরির সময় অবশ্যই আর্থিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনো বাড়ি-ঘর বিদ্যুতায়িত হলে যাতে তা প্রাকৃতিকভাবেই নিক্রিয় হয়ে যায়। মৃত্যুরুঁকি কমিয়ে আনতে বজ্রপাত শেল্টারের পাশাপাশি বাড়াতে হবে লাইটনিং প্রটেক্ট সিস্টেম (এলপিএস)। বিভিন্ন স্থাপনাতে যদি এলপিএস লাগানো যায় এবং যদি এলাকাভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা যায়, তাহলে বজ্রপাতের বুঁকি অনেক কমে যাবে। এছাড়া, সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত পূর্বাভাস ব্যবস্থা এবং নিরাপদ

আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণও অত্যন্ত জরুরি। গাছ তার জীবন দিয়ে বজ্রপাত থেকে মানুষ ও অন্য প্রাণীর জীবন রক্ষা করে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের করণীয়, দুত বর্ধনশীল গাছের চারা রোপণ করা। তাহাড়া, বজ্রপাত যেহেতু জলবায়ুসংক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু দূষণের প্রতিরোধ ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানোর ক্ষেত্রেও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, বিশ্বের সকল বিজ্ঞানীই একমত যে, জলবায়ু দূষণের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে গেছে। জলবায়ু দূষণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ী। বাংলাদেশসহ দরিদ্র দেশগুলোর দায় অনেক কম, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশ। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে বা একে মোকাবিলা করতে হলে সারাবিশ্বকেই একযোগে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো রক্ষার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাহায্য দিতে হবে। ক্ষতিপূরণসহ আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহের জন্য সরকারকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহাড়া, সরকারকেও বজ্রপাতসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে এবং প্রাকৃতিক পর্যায় পর্যন্ত এ বরাদের কার্যক্রম পৌছে দিতে হবে। তবেই, এর সুফল সবাই পাবে।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার